OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 702 - 706
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 702 - 706
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ-বিশ শতকের বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস চর্চা

প্রীতি দাস
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: Pritidas97pd@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
উত্তরবঙ্গ, ভ্রমণ, দার্জিলিঙ, কোচবিহার, মালদা, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, পুরাণ।

Abstract
Bengali travel literature, through the personal experiences of various travellers, offers a clear understanding of travel destinations and their diverse aspects, including history, geography, society, and culture. In the Bengali travel literature of the nineteenth and twentieth centuries, North Bengal also emerges as a distinct geographical, historical and cultural region through the travel narratives of several writers. The traveller's firsthand experiences, observations, and descriptions provide insights into various historical sites, settlements, political developments, social life, and cultural characteristics of North Bengal. These paper seeks to explore the nature and trends of the study of North Bengal's history through selected Bengali travel writings of the nineteenth and twentieth centuries. It primarily examines how the past of North Bengal has been read, interpreted, and reconstructed in travel literature, and how historical elements are reflected in these narratives.

Discussion

বাঙালির ভ্রমণচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে বাঙালির বাংলা ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। উনিশ-বিশ শতকের বাংলার প্রশাসনিক সীমানা একবিংশ শতাব্দীর প্রশাসনিক সীমানার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও সেই পার্থক্য ছিল। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দার্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) 'মেঘের মুলুক', স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) 'দার্জিলিং পত্র', বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) 'কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) 'মেঘের গায়ে জেলখানা' প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনিতে উত্তরবঙ্গের আভাস পাওয়া যেতে থাকে। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জনজীবন, সংস্কৃতি সম্পর্কে টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া যায় ভ্রামণিকদের লিপিবদ্ধ এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাগুলো থেকে। একজন ব্যক্তি যখন কোনো স্থান প্রত্যক্ষ করেন, তখন সেই স্থানে বর্তমানের পাশাপাশি তার অতীত নিয়েও কৌতূহলী হতে দেখা যায় তাকে। ফলে একটি ভ্রমণকাহিনি কেবলমাত্র ভ্রমণের বিবরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তা অনেক সময় একটি অঞ্চলের অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন হয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 702 - 706
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উত্তরবঙ্গের বর্তমান ও অতীতের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে যে দলিলটি মুখ্য হয়ে উঠেছে তা হল— সুবোধকুমার চক্রবর্তীর (১৯১৯-১৯৯২) 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-গৌড় পর্ব।

যেকোনো ভ্রমণসাহিত্যে ইতিহাসের উপস্থাপন ঠিক ইতিহাস গ্রন্থের মতো হয় না। ভ্রমণসাহিত্য থেকে ইতিহাস অন্বেষণের দুটি ধারা লক্ষণীয়—

১. যেকোনো ধরনের প্রসঙ্গে ভ্রামণিকের উপস্থাপিত ইতিহাস বর্ণনা।
২. ভ্রামণিকের বিবৃত অভিজ্ঞতা থেকে পাঠকের তৎকালীন সময়কে উপলব্ধি করা।

প্রথমক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠক এবং ভ্রামণিক উভয়ের কাছেই ইতিহাস কিন্তু দ্বিতীয়ক্ষেত্রে লেখকের কাছে বর্তমান সময়ের অভিজ্ঞতা এবং তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাঠকের কাছে ইতিহাস হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে একটি ছোট ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর দার্জিলিং ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছেন—

> "মলরোডের উত্তরে গভর্নমেন্ট হাউস ও সুদূরে রজত মেঘ তরঙ্গের ন্যায় তুষারচল শ্রেণির অপূর্ব উন্মুক্ত দৃশ্য। সুবিধা ও সৌন্দর্য এখানে একত্রে বিরাজিত। না হবে কেন এটা ইংরাজ ইন্দ্রের প্রধান আখড়া স্থান। এখানে তাঁরা মেয়ে-পুরুষে, হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ান। রোজ বিকালে এখানে ব্যান্ড বাজে। ব্যান্ডের কাঠের ঘরটি অনেক সময় তাঁদের আরাম ঘরের কাজ করে। বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হলে এইখানে তাঁরা বিশ্রাম করেন।"[১]

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ স্বর্ণকুমারী দেবী 'দার্জিলিং পত্র' নামক ভ্রমণকাহিনিটি লেখেন। 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও কার্ত্তিক সংখ্যায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে নিয়মিত এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। দার্জিলিঙের প্রকৃতি, দর্শনীয় স্থান, জনজাতি, সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই কাহিনিতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত বর্ণনাটি থেকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইংরেজদের জীবনযাত্রার একটি দিক ফুটে উঠেছে। এই বর্ণনাতে ইতিহাস না থাকলেও পরবর্তীকালে এর থেকে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের দিনযাপনের একটি টুকরো ছবি পাওয়া যায়। এরকম বহু চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে ভ্রামণিকের সমগ্র লেখাটি জুড়ে। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও দার্জিলিঙ বিষয়ক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কাহিনিতে। ইংরেজদের দার্জিলিঙ অভিযান, সিকিম ও ভুটানে প্রচলিত দাস ব্যবসা, দাস ব্যবসা নিবারণে ইংরেজের ভূমিকা, সিকিমের রাজা ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের ফলস্বরূপ সিকিমরাজ দার্জিলিঙ ইংরেজদের উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন, তার উল্লেখ লেখক করেছেন—

> "কমিশনার সাহেব এইরূপে পলাইয়া আসিয়া আবার অধিক সংখ্যক সৈন্যসামন্ত সঙ্গে সিকিং গমন করিলেন। যাইবার আগে রাজাকে এই মর্মে চিঠি লিখিয়া দিলেন যে তিনি যুদ্ধের জন্য যাইতেছেন না, —কেবল কথাবার্তা কহিতে যাইতেছেন। সেবারে সিকিং গিয়া ইংরাজ কৃতকার্য হইলেন, সিকিং ইংরাজের ক্ষমতা পূর্বে বুঝে নাই, এবার বুঝিল, বুঝিয়া সন্ধি স্থাপন করিল— ইংরাজ ছয় হাজার টাকা করে সমস্ত দার্জিলিং পাইলেন— কেবল তাহাই নহে, দাস ব্যবসায় সিকিং হইতে একেবারে উঠাইয়া দিতে রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন।"[২]

একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যে বর্ণিত ইতিহাস ইতিহাস গ্রন্থের নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য নয়। ইতিহাস গ্রন্থে, ইতিহাস বর্ণনায় তথ্যের উৎস নির্ণয় করা জরুরি। শিলালিপি, সরকারি নথি, দলিল, চিঠিপত্র, সমকালীন বিবরণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি উৎস নির্ণয় করা এবং পুনরায় যাচাই করে সেই তথ্যের ব্যবহার করা, কালানুক্রম মেনে চলা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ইতিহাস লেখক মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু ভ্রামণিকেরা ইতিহাসবিদের মতো ইতিহাস লেখেন না— তা সম্ভবও নয়। ইতিহাসের নিয়মাবলী মেনে ভ্রামণিক লিখতে বসলে তা ভ্রমণসাহিত্য না হয়ে ইতিহাস হয়ে উঠবে যা কাম্য নয়। যে কোনো ভ্রমণসাহিত্যে ইতিহাসের উপস্থাপন পর্যটকের কৌতূহল, জ্ঞান, রুচি, ব্যক্তিগত অনুভূতির মেলবন্ধনে হয়ে থাকে ফলে তা কখনও নিরপেক্ষ হয় না। ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গী এইক্ষেত্রে বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে। একই ঐতিহাসিক স্থানের প্রসঙ্গ এক একজনের লেখায় ভাবনায় এক একভাবে উঠে আসে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 702 - 706
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেমন, স্বর্ণকুমারী দেবীর আলোচনায় দার্জিলিঙের প্রসঙ্গে সিকিম, তিব্বত, ভূটানের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। তবে এতে সাল-তারিখ, রাজবংশের পরিচয়ের উল্লেখ নেই বললেই চলে। ইংরেজ ও সিকিমরাজের মধ্যে দার্জিলিংকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্কের সমীকরণ তৈরি হয়েছিল তাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

ভ্রমণসাহিত্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের উপস্থাপন কিছুটা স্থান-নির্ভর। দার্জিলিঙের রাজনৈতিক ইতিহাস বাদেও কোচবিহার এবং মালদা জেলার প্রসঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্তৃত উপস্থাপন দেখা যায় সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য' গ্রন্থের গৌড় পর্বে। উপন্যাসের আদলে রচিত এই গ্রন্থের ১৪ নং পর্বে গল্পের নায়ক নিজেকে কোচবিহারের ছেলে বলে পরিচয় দেয়। ভ্রমণসাহিত্যে সাধারণত ভ্রামণিক হয় একজন বহিরাগত পর্যবেক্ষক কিন্তু এই কাহিনিতে গোপাল নিজেকে কোচবিহারের ছেলে বলে এবং জন্মসূত্রে রাজবংশী বলে পরিচয় দিয়েছে। তাই তার চোখে কোচবিহারের রাজবাড়ি এবং রাজবংশের পরিচয় উঠে এসেছে স্বস্থান এবং স্বজাতির বর্ণনা হিসেবে। নায়ক কলকাতায় বাস করে। সে দার্জলিঙে এসেছে ঘটনাচক্রে। দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, গ্যাংটক ঘুরে-বেড়ানোর পাশাপাশি সে কাহিনির নায়িকা স্বাতিকে কোচবিহার সম্পর্কে জানাতে আরম্ভ করে নিজের স্মৃতিচারণ থেকে।

স্থানীয় কিংবদন্তী, পুরোনো স্থান, রাজা-রাজড়া, যুদ্ধ, নদী, গ্রাম, পুকুর, মন্দির, রাজ-বাড়ির সাহিত্যচর্চা, দেব-দেবীর পরিচয় ইত্যাদি লোকস্মৃতিমূলক তথ্য উত্তরবঙ্গের অতীত সম্পর্কে যে পরিচয় বহন করে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গ্রন্থের নায়ক নয়, স্বয়ং গ্রন্থ লেখকের জন্মস্থানও কোচবিহার। ফলে, লেখক তাঁর নির্মিত এই চরিত্রটির মাধ্যমে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেছেন তাতে তাঁর নাড়ীর টান রয়েছে। জন্মসূত্রে এই শিকড় প্রোথিত হয়ে আছে কোচবিহারের মাটির গভীরে। তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় গোপাল চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। ভ্রমণকাহিনির অন্যান্য পর্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে, লোকমুখে শুনে সেই সমস্ত স্থানের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু কোচবিহারের ক্ষেত্রে নায়কের ছোটবেলার স্মৃতি, স্কুলে পাঠ্য বইও, মাস্টার মশাইয়ের স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে।

গল্পের নায়ক বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই। এই প্রসঙ্গে গল্পের নায়ক লিখেছেন—

> "পুরাণ তো আমাদের প্রাচীন ইতিহাস। বিদেশীদের মতো রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে কাব্য বলে চিহ্নিত করা তো উচিত নয়। রামায়ণ ও মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা চলে। আর পুরাণ হল জাতীয় ইতিহাস, আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির দলিল। চেষ্টা করলে পুরাণকে ইতিহাস বলে প্রমাণ করতে পারা যায়। কিন্তু দেশের পণ্ডিতরা সে চেষ্টা করেন নি, দেশের মানুষও পুরাণ পাঠ বর্জন করেছে।"[৩]

তবে গ্রন্থলেখক এই চেষ্টা গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ অব্দি করেছেন। গৌড় পর্বে গৌড়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বিষ্ণুশর্মার 'হিতোপদেশ', স্কন্দ পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, 'রাজতরঙ্গিণী', পাণিনীর শ্লোক, কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা', শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আলোচনার উল্লেখ লেখকের ভ্রমণ কাহিনিগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তিকে অন্যমাত্রা দান করেছে।

কোচবিহারের ইতিহাসের প্রসঙ্গে কামতাপুর এবং কোচ রাজবংশের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসকে ভ্রমণসাহিত্যে উপস্থিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও প্রত্ননিদর্শন। তবে এই ইতিহাসের পাঠ সবসময় প্রামাণ্য ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন নয়। স্থানীয় জনশ্রুতি, কিংবদন্তী কিংবা প্রচলিত বিশ্বাসও অনেকসময় ঐতিহাসিক স্থানের ব্যাখ্যার অংশ হয়ে উঠেছে। তবে সেসমস্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে লেখক কোনটি কিংবদন্তী কিংবা কোনটি বাস্তবসম্মত তার উল্লেখ করেছেন। যেমন, কামতাপুর রাজবংশের শেষ রাজা নীলাম্বর সম্পর্কে লিখেছেন—

> "এই বংশের তৃতীয় ও শেষ রাজার নাম নীলাম্বর। ইনি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক রাজা। বাংলার সুলতান হুসেন শাহর সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—১৪৯৮ থেকে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সেই যুদ্ধেই কামতাপুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 702 - 706
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাস্তব হোক কিংবা অলৌকিক প্রচলিত বিশ্বাস বাদেও কোচবিহারের ইতিহাস প্রসঙ্গে লেখক যেসমস্ত গ্রন্থের এবং উৎসের উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হল—

১. অসমিয়া ভাষার কাব্যগ্রন্থ গুরুজন-কথা চরিত্রের প্রসঙ্গ। এই গ্রন্থ থেকে তিনি দুর্লভনারায়ণ ও গৌড়েশ্বর ধর্মনারায়ণের যুদ্ধ ও মিত্রতা এবং নীলধ্বজের গল্প বলেছেন।

২. কোচবিহারের আলোচনায় স্কুলপাঠ্য বই বাদে আমানতুল্লা খানচৌধুরী রচিত ইতিহাসগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

৩. জয়নাথ মুন্‌শী রচিত 'রাজোপাখ্যান'-এর উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "শতাধিক বৎসর পূর্বে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময় তাঁর দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আদেশে জয়নাথ মুন্‌শী এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তার থেকেই জানা যায় যে বর্তমান রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা নরনারায়ণের সভাসদ সর্ববেত্তা উপাধ্যায় যোগিনীতন্ত্র থেকে কিছু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তারপরে প্রাণনারায়ণের সময় রাজখণ্ড রচনা করেছিলেন কবিরত্ন। মার্শী ও শোভে সাহেবও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন। এইসবের উপরে নির্ভর করেই জয়নাথ মুন্‌শী রাজোপাখ্যান রচনা করেছেন গদ্যে।"[৫]

এই বক্তব্যে কোচ রাজপরিবার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের বেশ কিছু উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে সম্ভবত 'রাজোপাখ্যান' লেখকের পড়া; অন্ততপক্ষে গল্পের নায়কের কাছে সেই গ্রন্থ উপলব্ধ ছিল বলেই জানানো হয়েছে।

৪. যোগিনীতন্ত্রের উল্লেখ। কোচ রাজবংশের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ কেন শিববংশীয় বলে পরিচিত তার ব্যাখ্যা এই গ্রন্থ থেকে মেলে। যোগিনীতন্ত্র বাদেও বিশ্বসিংহ সম্পর্কে 'আকবরনামা'-তে উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার হান্টার সাহেবের গ্রন্থে বিশ্বসিংহ সম্পর্কে পৃথক পরিচয় পাওয়া যায়।

কোচবিহারের প্রায় আদি থেকে অন্তের এক ধারাবাহিক ইতিহাস লেখক নিপুণ হস্তে গল্প বলার ভঙ্গিতে বলে গেছেন। কোচ রাজপরিবারে বিশ্বসিংহ থেকে আরম্ভ করে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ এবং ধরেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত তিনি উল্লেখ করেছেন। ততদিনে কোচ-রাজবংশ ইংরেজদের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। এই পর্যন্ত বলে কোচবিহারের ইতিহাস থেকে পট পরিবর্তন করে গোপাল দার্জিলিঙের ইতিহাস বলতে আরম্ভ করে। দার্জিলিং কীভাবে সিকিম থেকে বিভক্ত হল সেই ইতিহাসই নতুন ভাবে বিবৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক শুধু ইতিহাসের গল্প বলেই থেমে থাকেননি। উপযুক্ত তথ্যাদির প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। তাই এই বর্ণনা স্বর্ণকুমারী দেবী বিবৃত ইতিহাসের গল্প থেকে সুবোধকুমার চক্রবর্তী বর্ণিত ইতিহাসের গল্প বেশ খানিকটা ভিন্ন পটভূমিতে বর্ণিত এবং তুলনামূলকভাবে বেশি তথ্যসমৃদ্ধ। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। দার্জিলিঙের প্রসঙ্গে ভুটিয়া ও গোর্খা জাতি, সিকিম রাজের সঙ্গে তাদের লড়াই, নেপাল, সিকিম, ভূটানের পরিবর্তিত সীমান্ত ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো বর্ণিত হয় এবং দার্জিলিং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে লেখেন—

> "বড়লাট তাঁর অসুস্থ কর্মচারীদের জন্য দার্জিলিঙ পাহাড়টি চেয়েছেন বলে বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ সিকিমপতি রাজা এই অঞ্চলটি তাঁকে উপহার দিলেন। ১৮৩৫ খীষ্টাব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি দার্জিলিঙ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল!"[৬]

সুবোধকুমার চক্রবর্তী সিকিম রাজের ইংরেজদের কাছে দার্জিলিং প্রদানের বিষয়টি বন্ধুত্বের উপহারস্বরূপ উপস্থাপন করলেও স্বর্ণকুমারী দেবী একে ইংরেজদের চতুর উপায়ে অবলম্বন করে সন্ধি স্থাপন করার পদ্ধতি হিসেবেই দেখিয়েছেন।

কোচবিহারের তুলনায় মালদার ইতিহাস কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোচবিহারের ইতিহাস কাহিনির নায়ক স্মৃতি থেকে বলেছিলেন। সশরীরে সেই স্থানে ভ্রমণের ছবি আঁকা হয়নি। গোপাল এবং স্বাতি একসঙ্গে মালদা ভ্রমণ করেছে। সেই ভ্রমণ চলাকালীন গোপাল স্বাতিকে মালদার ইতিহাস শুনিয়েছে বিভিন্ন শিলালিপি, গ্রন্থ, বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সূত্র ধরে। ভ্রমণ ও ইতিহাস পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে এই উপন্যাস রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনির প্রায় প্রতিটি পর্বেই। গৌড় পর্বে গল্পের কথক গোপাল নিজেদের ভ্রমণ ও ইতিহাসের পরিসর সম্পর্কে বলেছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 702 - 706
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "গৌড় থেকে একই পথ ধরে আমাদের ফিরতে হচ্ছে। মালদহের উপর দিয়ে যেতে হবে পাণ্ডুয়ায়। এ দিকে দশ মাইল, আর ও দিকে এগার মাইল পথ। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লাগবে। আমি ভেবেছিলুম যে স্বাতি হয়তো আমাকে ইতিহাসের কথা বলতে বলবে। কিন্তু তা বলল না। বলল একান্তভাবে নিজেদের কথা।"[৭] (পৃ. ২৮১)

কথকের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভ্রমণ, ইতিহাস ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের এক সুনিপুণ আলেখ্যই হয়ে উঠেছে 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-র পর্বগুলো। গৌড় পর্বের বিশেষত্ব হল এতে প্রাধান্য পেয়েছে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস গাথা। পত্রাকারে রচিত স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাই হোক কিংবা গল্পের ভঙ্গিমায় বলা সুবোধকুমার চক্রবর্তীর ভ্রমণ উপন্যাসই হোক না কেন এ পর্যন্ত এই প্রবন্ধে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট দিক সম্পর্কেই উল্লেখ করা হয়েছে— তা হল রাজনৈতিক দিক। ভ্রমণ কাহিনিগুলোতে রাজনৈতিক ইতিহাস বাদেও সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অতীত সম্পর্কেও প্রচুর তথ্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দার্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র' নামক গ্রন্থে 'দার্জিলিঙ্গের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত' বলে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদে লেখক দার্জিলিঙের পরিচয় সমেত তা কী করে ইংরেজদের হস্তগত হয় সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই কাহিনিটি বাদেও তাঁর গ্রন্থ থেকে অতীতে দার্জিলিঙের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাঁর লেখা থেকে—

> "শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ পর্য্যন্ত ৫০ $\frac{৩}{৪}$ মাইল রেলপথ পরিভ্রমণ করতে প্রায় ৭ ঘন্টা সময় লাগে। ১৮৮০ - ৮১ সালে এই পথ প্রস্তুত হয়। এই পথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে 'হিল কার্ট রোড' নামক রাস্তা অবলম্বন করিয়া লোকে, টোঙ্গা ও গো-মহিষাদির শকট আরোহণে দার্জ্জিলিঙ্গ গমন করিত। সে রাস্তাটি এখনও বর্ত্তমান আছে ও পাহাড়িয়াদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।"[৮]

অবশেষে একথা বলা যায় যে, ভ্রমণসাহিত্য সরাসরি ইতিহাস গ্রন্থ না হলেও এর মধ্যে এমন বহু উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে যার থেকে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ পরিসরে কোনো স্থান কিংবা কোনো জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং স্থানীয় ইতিহাস বোঝার মতো বহু উপাদান পাওয়া যায়। উনিশ-বিশ শতকের ভ্রমণসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের পরিসর অতি অল্পই। উত্তরবঙ্গ নিয়ে লেখা ভ্রমণকাহিনিগুলো সংখ্যায় অল্প, অধিকাংশই আয়তনে ছোট। ফলে এর ইতিহাস চর্চার পরিসরও কিছুটা কম। তবে যা রয়েছে, তার মধ্য থেকেই ব্রিটিশশাসিত উত্তরবঙ্গ, এখানকার পাহাড়ি জনজাতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতো অতীত কাহিনির সম্পর্কে বেশ জোরালো ধারণা গড়ে ওঠে।

Reference:

১. রীত, প্রত্যুষকুমার (সম্পা), *স্বর্ণকুমারী দেবী ভ্রমণকথা,* জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৯৪
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
৩. চক্রবর্তী, সুবোধকুমার, *রম্যাণি বীক্ষ্য অঙ্ক পর্ব,* এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৬০-৬১
৪. চক্রবর্তী, সুবোধকুমার, *রম্যাণি বীক্ষ্য গৌড় পর্ব,* এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫৫-৫৬
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ, *দার্জিলিঙ্গ-প্রবাসীর পত্র,* প্রকাশক শ্রীপ্রসন্নকুমার সরকার, ১৮৯৫, পৃ. ৪-৫